প্রথম অধ্যায়

উন্নততর জীবনধারা

খাদ্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। দেহের বৃদ্ধি এবং বিকাশ, দেহের টিস্যুগুলোর ক্ষতি পূরণ কিংবা শক্তি উৎপাদন-এ ধরনের কাজের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের বিশেষ কয়েক ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে, যে খাদ্য আমরা খাই তার গুণগত মানের ওপর। খাদ্য আমাদের চেহারায়, কাজকর্মে, আচরণে ও জীবনের মানে পার্থক্য ঘটাতে পারে। শ্বসন ক্রিয়ার সময় খাদ্যের ভেতরকার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি হিসেবে মুক্ত হয়ে জীবদেহের জৈবিক ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকটা জীব তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনমতো এবং পরিমাণমতো খাদ্য গ্রহণ করে। প্রতিটি খাদ্যই আসলে এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ। এই জটিল খাদ্যগুলো বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ভেঙে সরল খাদ্যে পরিণত হয়, এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। পরিপাক হওয়া খাদ্য শোষিত হয়ে দেহকোষের প্রোটোপ্লাজমে সংযোজিত হয়, যাকে আত্তীকরণ বলে। পরিপাকের পর অপাচ্য খাদ্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খাদ্য উপাদান ও আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাকৃতিক খাদ্য এবং ফাস্ট ফুডের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভিটামিনের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজ লবণের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানি ও আঁশযুক্ত খাবারের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া বলতে পারব।
- শরীরে তামাক ও ড্রাগসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস কী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিবিজ্ঞান অনুসারে আমরা যা খাই তার সবই কিন্তু খাদ্য নয়। শুধু সেই সব আহার্য বস্তুকেই খাদ্য বলা যাবে, যেগুলো জীবদেহে বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পূরণ করে, এক কথায় দেহের পুষ্টি সাধন করে। পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু আহরণ করে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আত্তীকরণ দ্বারা দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা। পুষ্টির ইংরেজি শব্দ Nutrition; অপরদিকে খাদ্যের যেসব জৈব অথবা অজৈব উপাদান জীবের জীবনীশক্তির যোগান দেয়, তাদের একসঙ্গে পরিপোষক বা নিউট্রিয়েন্টস (Nutrients) বলে। যেমন: গ্লুকোজ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস। পরিপোষকের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না, প্রাণীরা খাদ্যের মাধ্যমে পরিপোষক গ্রহণ করে। আমরা বলতে পারি, খাদ্যের কাজ প্রধানত তিনটি:

১. খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

২. খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন করে, কর্মশক্তি প্রদান করে।

৩. খাদ্য রোগ প্রতিরোধ করে, দেহকে সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখে।

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের উপাদান ছয়টি (চিত্র ১.০১), সেগুলো হলো: শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি। এগুলোর মধ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ (বা ফ্যাট) দেহ পরিপোষক খাদ্য। খাদ্যের স্নেহ এবং শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদক খাদ্য এবং আমিষযুক্ত খাদ্যকে বলা হয় দেহ গঠনের খাদ্য। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি দেহ সংরক্ষক খাদ্য উপাদান, যেগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

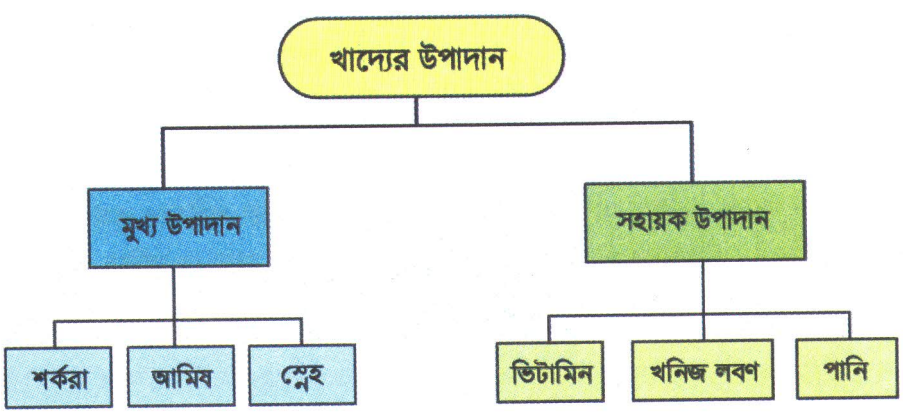

চিত্র ১.০১: খাদ্যের ছয়টি উপাদান

১.১.১ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা তৈরি হয়। শর্করা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং অল্প মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শর্করা আমাদের শরীরে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।

বেশ কয়েক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এবং এদের উৎসও ভিন্ন। যেমন:

উদ্ভিজ্জ উৎস

শ্বেতসার বা স্টার্চ: ধান, গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য দানা স্টার্চের প্রধান উৎস। এছাড়া আলু, রাঙা আলু বা কচুতেও শ্বেতসার বা স্টার্চ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ: এটি চিনির তুলনায় মিষ্টি কম। এই শর্করাটি আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ফ্রুকটোজ: আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি মিষ্টি ফলে এবং ফুলের মধুতে ফ্রুকটোজ থাকে। একে ফল শর্করাও (Fruit Sugar) বলা হয়ে থাকে।

সুক্রোজ: আখের রস, চিনি, গুড়, মিছরি এর উৎস।

সেলুলোজ: বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম, শুকনো ফল এবং সব ধরনের শাক-সবজিতে সেলুলোজ থাকে।

প্রাণিজ উৎস

ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা: গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণীর দুধে এই শর্করা থাকে।

গ্লাইকোজেন: পশু ও পাখিজাতীয় (যেমন: মুরগি, কবুতর প্রভৃতি) প্রাণীর যকৃৎ এবং মাংসে (পেশি) গ্লাইকোজেন শর্করাটি থাকে।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

আমাদের শরীরের পুষ্টিতে শর্করার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। শর্করা শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে। জীবদেহে বিপাকীয় (Metabolic) কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে খাদ্যঘাটতিতে বা অধিক পরিশ্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা, এটি আঁশযুক্ত খাদ্য এবং এটি আমাদের দৈনন্দিন মল ত্যাগে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিন কিংবা ফ্যাটের অভাব হলে শর্করা থেকে এগুলো সংশ্লেষ

বা তৈরি হয়।

শর্করার অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় শর্করাজাতীয় খাদ্য খেতে হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ আবার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। তখন শরীর স্থূলকায় হতে পারে; কখনো কখনো বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা বাতাস থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটি ফুসফুসে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্তের লোহিত কণিকা এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের কোষে পৌঁছে দেয়, সেখানে গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি তৈরি করে এবং এই তাপশক্তি আমাদের সকল শক্তির উৎস।

খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাদ্য ক্যালরি বা কিলোক্যালরি হিসেবে মাপা হয়। ক্যালরি হচ্ছে শক্তির একক। এক গ্রাম খাদ্য জারণের ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যের ক্যালরি বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১° (ডিগ্রি) সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ তাপশক্তি হচ্ছে এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি সমান এক কিলোক্যালরি বা এক খাদ্য ক্যালরি (One Food Calorie)। খাদ্যের ক্যালরিকে কিলোক্যালরি দিয়ে বোঝানো হয়। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, শর্করা এবং প্রোটিনের ক্যালরি প্রায় সমান, ৪ kcal/g। স্নেহজাতীয় খাদ্যে অর্থাৎ ফ্যাটের ক্যালরি সবচেয়ে বেশি— এর পরিমাণ ৯ kcal/g। একটা খাদ্যের খাদ্য ক্যালরি বলতে বোঝায় খাদ্যটি সম্পূর্ণভাবে জারণ হলে কতখানি শক্তি বের হবে। (একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের দৈনিক ২৫০০ kcal এবং একজন নারীর ২০০০ kcal এর সমপরিমাণ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

১.১.২ আমিষ বা প্রোটিন

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন— এ চারটি মৌলের সমন্বয়ে আমিষ তৈরি হয়। শরীরে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর সেগুলো অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। অর্থাৎ বলা যায় একটি নির্দিষ্ট আমিষের পরিচয় হয় কিছু অ্যামাইনো এসিড দিয়ে। মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এই অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে আমিষ গঠনের একক।

উৎস দিয়ে বিবেচনা করা হলে আমিষ দুই প্রকার: প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা প্রাণিজ আমিষ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির— এগুলো প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আমিষ। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, বাদাম হচ্ছে উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো এসিডকে (লাইসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনাইনকে) অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। এই আটটি অ্যামাইনো এসিড ছাড়া অন্য সবগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীর সংশ্লেষ করতে পারে। প্রাণিজ প্রোটিনে এই অপরিহার্য আটটি অ্যামাইনো এসিড বেশি থাকে বলে এর পুষ্টিমূল্য বেশি।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সয়াবিন, মটরশুঁটি বীজ এবং ভুট্টার মধ্যে পুষ্টিমূল্য বেশি এমন প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড থাকে না বলে এদের পুষ্টিমূল্য কম।

প্রাণীদেহের গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। দেহকোষের বেশির ভাগই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। দেহের হাড়, পেশি, লোম, পাখির পালক, নখ, পশুর শিং— এগুলো সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। তোমরা জেনে অবাক হবে প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% হচ্ছে প্রোটিন।

১.১.৩ স্নেহ পদার্থ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত হয়। আমাদের খাবারে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন: মাছ কিংবা মাংসের চর্বি। যেসব স্নেহ পদার্থ তরল, সেগুলোকে তেল বলে, তেল হচ্ছে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো তরল থাকে। যেমন: সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার। যেমন:

১. প্রাণিজ স্নেহ: চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম— এগুলো হচ্ছে প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের উৎস।

২. উদ্ভিজ্জ স্নেহ: বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিজ্জ তেল স্নেহ পদার্থের উৎস। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, ভুট্টা, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম প্রভৃতির তেলে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এবং চিনা বাদামও স্নেহ পদার্থের ভালো উৎস।

স্নেহ পদার্থের কাজ

১. খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ পদার্থ সবচেয়ে বেশি তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

২. দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য স্নেহ পদার্থ অতি আবশ্যক।

৩. স্নেহ পদার্থ দেহ থেকে তাপের অপচয় বন্ধ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪. ত্বকের মসৃণতা এবং সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৫. যেসব ভিটামিন (A, D, E এবং K) স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়, সেগুলো শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। ত্বক শুষ্ক এবং খসখসে হয়ে সৌন্দর্য নষ্ট

হয়। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের অভাব হলে শরীরের সঞ্চিত প্রোটিন ক্ষয় হয় এবং দেহের ওজন কমে যায়। আবার শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ জমা হলে দেহে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং এ কারণে মেদবহুল দেহে সহজে রোগ আক্রমণ করে।

১.১.৪ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ থাকার পরেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। ঐ খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন হচ্ছে জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। আমরা যদি প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজিসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাই তাহলে আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন পেয়ে যেতে পারি।

কয়েকটি ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়, আবার কয়েকটি ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। যেমন:

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন A, ভিটামিন D, ভিটামিন E ও ভিটামিন K।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C।

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A

প্রাণিজ উৎসের মধ্যে ডিম, গরুর দুধ, মাখন, ছানা, দই, ঘি, যকৃৎ ও বিভিন্ন তেলসমৃদ্ধ মাছে, বিশেষ করে কড মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি, যেমন- লালশাক, কচুশাক, পুঁইশাক, পাটশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুদিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন: আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A রয়েছে।

কাজ : ভিটামিন A যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. দেহের স্বাভাবিক গঠন এবং বর্ধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কাজ নিশ্চিত করে।

২. দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন: ত্বক, চোখের কর্নিয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৩. হাড় এবং দাঁতের গঠন এবং দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে।

৪. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার : ভিটামিন A— এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে চোখের কর্নিয়ায় আলসার হতে পারে— এ অবস্থাকে জেরপথ্যালমিয়া রোগ বলে। এই রোগ হলে আক্রান্ত মানুষ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন A— এর অভাবে দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় ঘা, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। ভিটামিন A— এর অভাবে ত্বকের লোমকূপের গোড়ায় ছোট ছোট গুটির সৃষ্টি হতে পারে।

ভিটামিন D

একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই ভিটামিন D পাওয়া যায়। এই ভিটামিন সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে মানুষের ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। ডিমের কুসুম, দুধ এবং মাখন ভিটামিন D— এর প্রধান উৎস। বাঁধাকপি, যকৃৎ এবং তেলসমৃদ্ধ মাছে ভিটামিন D পাওয়া যায়।

ভিটামিন D শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে, যা হাড় তৈরির কাজে লাগে। ভিটামিন D— এর অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে। দৈনিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন D গ্রহণ করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এর ফলে অধিক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হওয়ায় রক্তে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে বৃক্ক (কিডনি), হৃৎপিণ্ড, ধমনি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে।

ভিটামিন E

সব রকম উদ্ভিজ্জ ভোজ্য তেল বিশেষ করে পাম তেল ভিটামিন E— এর ভালো উৎস। প্রায় সব খাবারেই কমবেশি ভিটামিন E আছে। তাছাড়া শস্যদানার তেল (Corn oil), তুলা বীজের তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, লেটুস পাতা ইত্যাদিতে ভিটামিন E পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে ভিটামিন E হলো এন্টি-অক্সিডেন্ট, যেটি ধমনিতে চর্বি জমা রোধ করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে। এ ছাড়া ভিটামিন E কোষ গঠনে সাহায্য করে এবং মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ভিটামিন E— এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যুও হতে পারে। দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে এই ভিটামিনের বিশেষ অভাব হয় না।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B কমপ্লেক্স

পানিতে দ্রবণীয় ১২টি ভিটামিন B রয়েছে। ভিটামিনের এই গুচ্ছকে ভিটামিন B কমপ্লেক্স বলা হয়। দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য খাবারে ভিটামিন B কমপ্লেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কাজ, দেহকোষে বিপাকীয় কাজ, প্রজনন ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের উপস্থিতি অতি আবশ্যক।

ভিটামিন B কমপ্লেক্সভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলোর উৎস এবং অভাবজনিত রোগ নিচের টেবিলে দেওয়া হলো:

ভিটামিন	উৎস	অভাবজনিত রোগ
থায়ামিন (B1)	ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, ডাল, তেলবীজ, বাদাম, যকৃৎ, টাটকা ফল ও সবজি। প্রাণিজ উৎসের মাঝে রয়েছে যকৃত, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি।	দেহে থায়ামিনের চরম অভাবে বেরিবেরি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর অভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, খাওয়ায় অরুচি, ওজনহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
রাইবোফ্ল্যাভিন (B2)	যকৃৎ, দুধ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, গাছের কচি ডগা, অঙ্কুরিত বীজ।	এর অভাবে ঠোঁটের দুপাশে ফাটল দেখা দেয়, মুখে ও জিভে ঘা হয়, ত্বক খসখসে হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর অভাবে তীব্র আলোতে চোখ খুলতে অসুবিধা হয়।
নিয়াসিন বা নিকোটিনিক এসিড (B5)	মাংস, যকৃৎ, আটা, ডাল, বাদাম, তেলবীজ, ছোলা, শাক-সবজি।	এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। পেলেগ্রা রোগে ত্বকে রঞ্জক পদার্থ জমতে শুরু হয় এবং সূর্যের আলোয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে ত্বকে লালচে দাগ পড়ে এবং ত্বক খস খসে হয়ে যায়। এছাড়া জিভে রঞ্জক পদার্থ জমে জিভের এট্রোফি হয়।
পিরিডক্সিন (B6)	চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ছোলা, ছত্রাক, বৃক্ক, ডিমের কুসুম।	এর অভাবে খাওয়ায় অরুচি, বমিভাব ও অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
কোবালামিন বা সায়ানোকোবালামিন (B12)	যকৃৎ, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির, বৃক্ক প্রভৃতি।	এর অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক এসিড)

টাটকা শাক-সবজি এবং টাটকা ফলে ভিটামিন C পাওয়া যায়। শাক-সবজির মধ্যে মুলাশাক, লেটুস পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, করলা ইত্যাদিতে ভিটামিন C আছে। ফলের মধ্যে আমলকী, লেবু, কমলালেবু, টমেটো, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ভিটামিন C— এর উৎস। শুকনো ফল ও বীজে এবং টিনজাত খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে না।

ভিটামিন C শরীরে যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. ত্বক, হাড়, দাঁত ইত্যাদির কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগিয়ে মজবুত গাঁথুনি তৈরি করে।

২. শরীরের ক্ষত পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করে।

৩. দাঁত ও মাড়ি শক্ত রাখে।

৪. স্নেহ, আমিষ ও অ্যামাইনো এসিডের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন C গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. ত্বক মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে।

৬. রোগ প্রতিরোধ করে।

ভিটামিন C— এর তীব্র অভাবে স্কার্ভি (দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া) রোগ হয়। এর অভাবে (ক) অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না। (খ) ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। (গ) দাঁতের মাড়ি ফুলে দাঁতের ইনামেল উঠে যায়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে। (ঘ) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়ে সহজে ঠাণ্ডা লাগে।

একক কাজ

কাজ: আমরা যে ভিটামিনগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, দেহে সেগুলোর অভাব হলে কী কী রোগ দেখা দিতে পারে তার একটা চার্ট প্রস্তুত কর।

১.১.৫ খনিজ পদার্থ এবং পানি

জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য ভিটামিনের মতো খনিজ পদার্থ বা খনিজ লবণও খুবই প্রয়োজনীয়। খনিজ পদার্থ প্রধানত কোষ গঠনে সাহায্য করে। প্রাণীরা প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে খনিজ পদার্থ পায়। আমরা শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, ডিম, মাছ এবং পানীয় জলের মাধ্যমে আমাদের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করি। নিচে শরীরের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদানগুলোর উৎস, পুষ্টিগত গুরুত্ব এবং অভাবজনিত সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করা হলো:

লৌহ (Fe)

লৌহ রক্তের একটি প্রধান উপাদান। প্রতি ১০০ ml রক্তে লৌহের পরিমাণ প্রায় ৫০ mg। যকৃৎ, প্লীহা, অস্থিমজ্জা এবং লোহিত রক্তকণিকায় এটি সঞ্চিত থাকে। লৌহের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে ফুলকপির পাতা, নটেশাক, নিম পাতা, ডুমুর, কাঁচা কলা, ভুট্টা, গম, বাদাম, বজরা ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম, যকৃৎ ইত্যাদি। লৌহের প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করা। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ

কমে গেলে রক্তশূন্যতা রোগ হয়। রক্তশূন্যতা রোগের লক্ষণ চোখ ফ্যাকাসে হওয়া, হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

ক্যালসিয়াম (Ca)

এটি প্রাণীদের হাড় এবং দাঁতের একটি প্রধান উপাদান। মানুষের শরীরের মোট ওজনের শতকরা দুই ভাগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অস্থি এবং দাঁতে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে এর ৯০% শরীরে সঞ্চিত থাকে। রক্তে এবং লসিকাতে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্যালসিয়ামের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে: ডাল, তিল, সয়াবিন, ফুলকপি, গাজর, পালংশাক, কচুশাক, লালশাক, কলমিশাক, বাঁধাকপি এবং ফল। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: দুধ, ডিম, ছোট মাছ, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি।

হাড় এবং দাঁতের গঠন শক্ত রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম রক্ত সঞ্চালনে, হৃৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে এবং স্নায়ু ও পেশির সঞ্চালনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে রিকেটস এবং বয়স্ক নারীদের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয় এবং তাদের রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে।

ফসফরাস (P)

দেহে পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের স্থান। ফসফরাসও ক্যালসিয়ামের মতো হাড়ের একটি প্রধান উপাদান। ফসফরাস হাড়, যকৃৎ এবং রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি এবং শর্করা বিপাকের দ্বারা শক্তি উৎপাদনে ফসফরাস প্রধান ভূমিকা রাখে।

ফসফরাসের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে: দানা শস্য, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, বাদাম ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা ইত্যাদি।

ক্যালসিয়ামের মতো হাড় এবং দাঁত গঠন করা ফসফরাসের প্রধান কাজ। ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, অস্থিক্ষরতা, দন্তক্ষয়— এইসব রোগ দেখা দেয়। খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম থাকলে ফসফরাসের অভাব হয় না।

পানি (Water)

পানি খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। মানবদেহের জন্য পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন এবং অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০%-৭৫% হচ্ছে পানি। আমাদের রক্ত, মাংস, স্নায়ু, দাঁত, হাড় ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানির প্রয়োজন।

দেহকোষ গঠন এবং কোষের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া পানি ছাড়া কোনোভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব

না। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের নানা প্রয়োজনীয় উপাদান শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরিবাহিত হয়। এটি জীবদেহে দ্রাবকের কাজ করে, খাদ্য উপাদানের পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করে। বিপাকের ফলে দেহে উৎপন্ন ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত পদার্থগুলোকে পানি মূত্র ও ঘাম হিসেবে শরীর থেকে বের করে দেয়। এ ছাড়া পানি শরীর থেকে ঘাম নিঃসরণ এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

শরীরে পানির উৎস :

১. খাবার পানি, পানীয় যেমন: চা, দুধ, কফি, শরবত।

২. বিভিন্ন খাদ্য যেমন: শাক-সবজি ও ফল।

শরীর থেকে মোট নির্গত পানির পরিমাণ গৃহীত পানির পরিমাণের সমান হলে শরীরে পানির সমতা বজায় থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২-৩ লিটার পানি পান করা উচিত, কারণ প্রায় ঐ পরিমাণ পানি প্রত্যেকদিনই আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

গরম আবহাওয়ায়, কঠোর পরিশ্রমে দেহে পানির অভাব দেখা দেয়। এ সময় পানি পানের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে শরীরে পানির অভাব হতে পারে। শরীরে পানির অভাব হলে তীব্র পিপাসা হয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, ত্বক কুঁচকে যায়। পানির অভাবে স্নায়ু ও পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট করে এসিডোসিস রোগের সৃষ্টি হয়। শরীরে পানি ১০% কমে গেলে সংজ্ঞা লোপ পায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অত্যধিক বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণেও শরীর থেকে অনেক পানি বের হয়ে যেতে পারে। শরীরে পানির অভাব নিরসনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হয়। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, খাবার স্যালাইন তা পূরণ করে শরীরে পানি ও লবণের ভারসাম্য ঠিক রাখে। (বাসায় খাবার স্যালাইন না থাকলে এক চিমটি লবণ, এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং এক গ্লাস পানি মিশিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায়।)

১.১.৬ রাফেজ বা আঁশ

এখন পর্যন্ত যে সকল খাদ্য উপাদান নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান হচ্ছে রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার। রাফেজ প্রধানত উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসাসমেত টাটকা ফল এবং শাক-সবজি রাফেজের প্রধান উৎস। এগুলো ছাড়াও শুকনা ফল, জিরা, ধনে, মটরশুঁটি প্রভৃতিতে বেশ ভালো পরিমাণ রাফেজ পাওয়া যায়। এই খাবারগুলোর দীর্ঘ তন্তুময় অংশকে রাফেজ বলে। রাফেজ মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর। রাফেজ আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না সত্যি কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ

করতে সাহায্য করে। তবে ঠিক কীভাবে এ রোগগুলো প্রতিরোধ করে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। রাফেজ সরাসরি খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। এটি খাদ্যনালির গায়ে কোনোরূপ পিণ্ড তৈরি করে না বলে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

রাফেজভুক্ত খাবারের গুরুত্ব

১. এটি পরিপাকে সহায়তা করে। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

২. শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. এটি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

৪. বারবার ক্ষুধার প্রবণতা কমাতে এটি কাজ করে।

৫. ধারণা করা হয়, রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণে পিত্তথলির রোগ, খাদ্যনালি ও মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকস, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা অনেকাংশে হ্রাস করে।

এ কারণে প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। শাক-সবজি ও ফল থেকে এ পরিমাণ আঁশ পাওয়া সম্ভব।

১.২ বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা দেহের ভরসূচি

শিশু জন্মগ্রহণের পর তার দেহের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং পরবর্তীকালে শৈশব, কৈশোর পার হয়ে যৌবন ও প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হয়। মানবদেহের বৃদ্ধি ২০-২৪ বছর পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর আর উচ্চতার বৃদ্ধি হয় না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল এবং নীরোগ রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থ্যের জন্য দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককে বিএমআই (BMI: Body Mass Index) বা ভরসূচি বলা হয়। উচ্চতার সাথে যদি দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকে, তবেই পুষ্টিগত দিক থেকে শরীর সুস্থ বলা হয়।

বিএমআইয়ের সূত্র হচ্ছে:

$$\text{দেহের ওজন (কেজি)}/[\text{দেহের উচ্চতা (মিটার)}]^২$$

অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে, সেটি হবে সেই ব্যক্তির বিএমআই বা ভরসূচি।

উদাহরণ

ধরা যাক একজনের দেহের ওজন ৮০ কেজি এবং উচ্চতা ১.৮ মিটার তাহলে
বিএমআই = ৮০/(১.৮ X ১.৮) = ২৪.৭ (প্রায়)

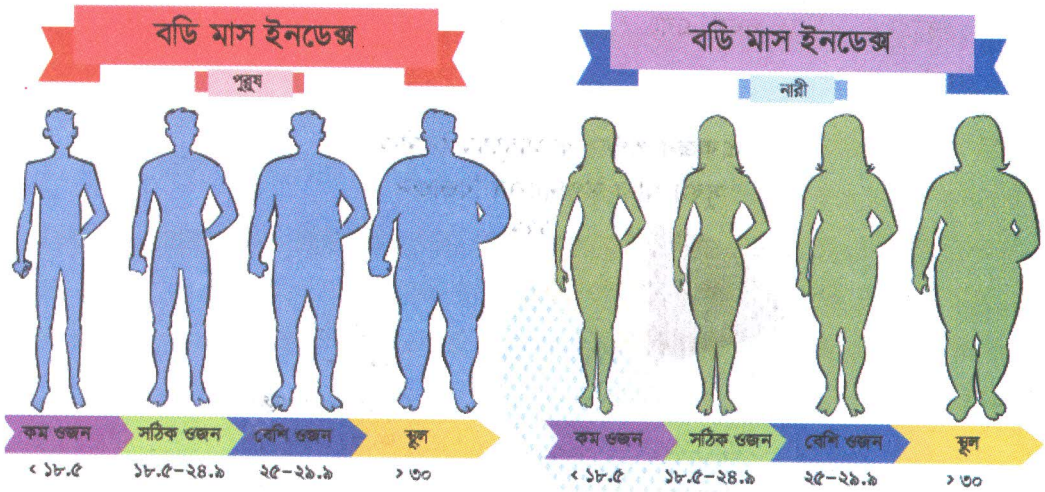

চিত্র ১.০২: বডি মাস ইনডেক্স

আমাদের দেহে চর্বির পরিমাণের নির্দেশক হচ্ছে বিএমআই। ১.০২ চিত্রে দেখানো হয়েছে ২৫ হচ্ছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিএমআই। এর কম হলে একজনকে কম ওজন এবং বেশি হলে তাকে স্থূলকায় বলে বিবেচনা করা যাবে।

দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের শ্রেণির সবার বিএমআই বের করে সেটি গ্রাফে ছক (চিত্র ১.০৩) হিসেবে দেখাও। তোমাদের শ্রেণির গড় বিএমআই কতো।

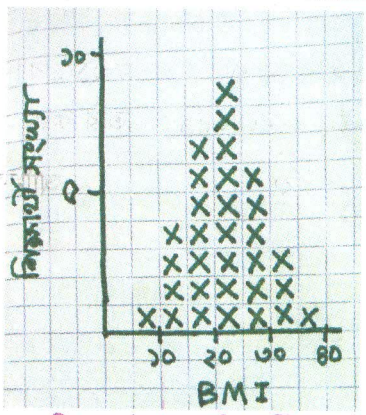

চিত্র ১.০৩: বিএমআই এবং শিক্ষার্থী সংখ্যার ছক

১.৩ দৈনিক খাবার কেমন হবে

এ অধ্যায়ে পুষ্টিগত গুরুত্ব আলোচনার সময় আমরা ক্যালরি ও কিলোক্যালরি সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছি। একজন পূর্ণবয়সের শারীরিক পরিশ্রম করা মানুষের দৈনিক ২০০০-২৫০০ কিলোক্যালরি খাবার গ্রহণ করা উচিৎ। ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং রাফেজ বা আশেঁর জন্য এর সাথে প্রয়োজনীয় শাক-সবজি এবং ফল খাওয়া প্রয়োজন।

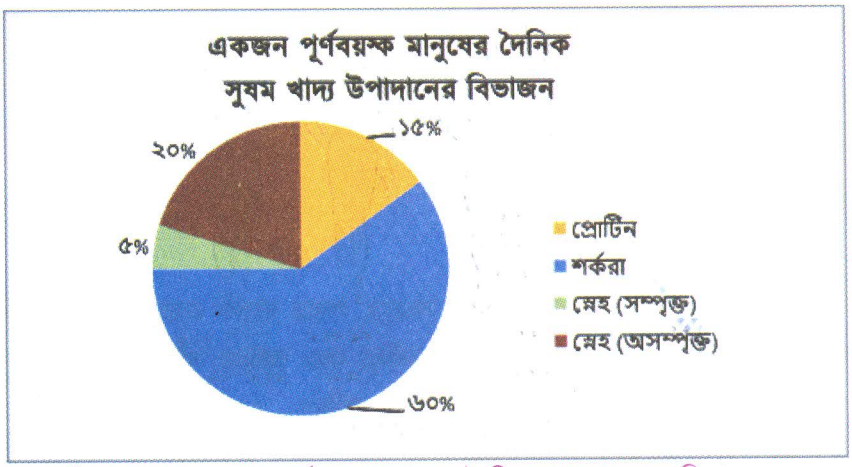

চিত্র ১.০৪: একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক সুষম খাদ্যের বিভাজন

একক কাজ

কাজ: ইলিশ মাছ, মুরগির ডিম, চর্বিযুক্ত মাংস, মসুর ডাল, দই, ভাত, গোল আলু, চিনি, তেল, মিষ্টি কুমড়া, ফুলকপি, টমেটো, ছোট মাছ, ছোলা, আইসক্রিম, রুটি, মধু, ঘি, পুঁইশাক, কাঁঠাল, আম।

উপরে আমাদের অতিপরিচিত ২১ প্রকার খাদ্য আছে। এ খাদ্যগুলো নিয়ে নিচের টেবিলে খাদ্যের উপাদানের একটি তালিকা তৈরি কর।

শর্করা	আমিষ	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন ও খনিজ লবণ	
			শাক-সবজি	ফল

এবার খাবারগুলোকে কম দাম এবং বেশি দাম হিসেবে বিভক্ত কর। তুমি একটি স্বল্পমূল্যের ও একটি অধিক মূল্যের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর।

খাদ্যতালিকা

খাদ্য উপাদানের নাম	কম দামের খাদ্যের নাম	বেশি দামের খাদ্যের নাম
১. শর্করা ২. আমিষ ৩. স্নেহ ৪. ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ ফল ৫. খনিজ লবণযুক্ত তরকারি/ ফল		

উপরের টেবিলটি থেকে তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হলেই যে অনেক দামি খাবার খেতে হয় সেটি সত্যি নয়। আমরা সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে অনেক কম খরচেই অনেক স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারি।

১.৩.১ সুষম খাদ্য

খাদ্য কী এবং খাদ্যের উপাদানসমূহ কী কী, আমরা সেটি এর মাঝে জেনে গেছি। প্রয়োজন থেকে কম খেলে যেরকম আমাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, ঠিক সেরকম প্রয়োজন থেকে বেশি খেলেও স্বাস্থ্যহানি হয়। বেশী খেয়ে স্থূলকার হয়ে যাওয়া উন্নত বিশ্বের মানুষের একটি বড় সমস্যা। তাই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সব সময় সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে বোঝায় না। যে খাদ্যে ছয়টি উপাদানই গুণাগুণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং যে খাদ্য গ্রহণ করলে দেহে স্বাভাবিক কাজ-কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়, তাকে সুষম খাদ্য (বা ব্যালান্সড ডায়েট) বলে। যেমন: একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ এবং নারীর বেলায় ২০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি বা ক্যালরি আমরা খাদ্য থেকে পাই। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এমন ধরনের খাদ্য থাকা দরকার, যাতে সে খাদ্যের মধ্যে ছয়টি উপাদানই সঠিক পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যতালিকা তৈরির সময় মানুষের বয়স, লিঙ্গভেদ, কী রকম কাজ করে (অর্থাৎ অধিক পরিশ্রমী, মাঝারি পরিশ্রমী নাকি স্বল্প পরিশ্রমী) ইত্যাদি বিবেচনা করা দরকার। শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্যতালিকায়

সহজপাচ্য এবং চর্বি বর্জিত খাদ্যের প্রাধান্য থাকতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য এবং হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসসমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী নারীদের খাদ্যতালিকায় রক্ত উৎপাদনের জন্য এবং ভ্রূণস্থ শিশুর বৃদ্ধির জন্য বাড়তি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিন থাকা খুবই প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট সুষম খাদ্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সুষম খাদ্য তৈরি করে নিতে হয়।

সুষম খাদ্য যেভাবে প্রস্তুত করা হয়

শর্করা	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন	খনিজ লবণ
ভাত	মাছ	মাখন	দুধ, ডিম	দুধ
রুটি	মাংস	তেল	ফলমূল	ডিম
চিনি/গুড়	ডিম	ঘি	মাছ, মাংস	শাক-সবজি

সুষম খাদ্য পিরামিড

যেকোনো সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ এবং স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই এর মাঝে লক্ষ করেছে যে একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা নারীর সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণ বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ,

চিত্র ১.০৫: সুষম খাদ্য পিরামিড

স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড (চিত্র ১.০৫) বলে। এই পিরামিডের দিকে তাকালেই কোন ধরনের খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

১.৩.২ উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই

সব মানুষের খাদ্যাভ্যাস এক রকম নয়। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতাও সব দেশে এক রকম নয়। শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুসারেও খাদ্যের প্রয়োজন এবং পার্থক্য রয়েছে। সকল পরিবেশে মানিয়ে চলাই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এ জন্য দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে এবং শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে মূল খাদ্য উপাদানগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল উপাদানগুলোর পরিমাণ এবং ক্যালরি ভ্যালু বিচার করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই করতে হয়।

আমরা খাদ্য পিরামিডে কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় সেটা দেখিয়েছি। এখন আমরা বলব এই খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে কী কী খাদ্য তৈরি করা যায়। যেমন খাদ্য পিরামিডের দেখানো তেল কিংবা মাখন সরাসরি খাওয়া হয় না, সেটি ব্যবহার করে অন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়।

পুষ্টি বিশারদগণ এই খাবারকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো:

১. মাংস, মাছ, ডিম ও ডাল (মটর, ছোলা কিংবা বাদাম)।

২. পনির ও দই।

৩. সকল ভোজ্য ফল এবং খাওয়ার উপযোগী সবজি।

৪. শস্য ও শস্যদানা থেকে তৈরি খাবার যেমন: রুটি, ভাত।

সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিন এই চার শ্রেণির খাদ্য খেতে হবে। এই চার শ্রেণি থেকে খাদ্য নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকা উচিত বলে পুষ্টিবিদগণ মনে করেন।

খাবার তৈরি করার সময় লক্ষ রাখতে হবে সেখানে যেন আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে।

সকালের খাবার আমাদের দেশে অত্যন্ত হালকা ধরনের হয়ে থাকে। আজকাল গ্রাম বা শহরে প্রায় সর্বত্রই বয়স্কদের সকালের দিকে চা পান করতে দেখা যায়। চায়ের সাথে অন্তত হালকা কিছু খাবার গ্রহণ করা উচিত। সকাল বেলায় খাবার হিসেবে রুটি, মাখন বা একটি ডিম, একটি কলা খেতে পারলে দেহের যাবতীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সংগ্রহ করা সহজ হবে। গরমের দিনে আখের গুড়ের সাথে চিড়া ভিজিয়ে খেলে শরীর সুস্থ থাকে।

আমাদের দেশে দুপুরের খাবারকে সাধারণত প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুপুরের খাবারের খাদ্য উপাদান বাছাইয়ে অবশ্যই সুষম খাদ্যতালিকার সাহায্য নিয়ে সেভাবে খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। গরমের দেশে মাছ প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস। তবে শীতকালে মাছের সাথে মাংস খাবারের মাঝে বৈচিত্র্য এনে দেবে। খাওয়ার শেষে দই অথবা ফল খাদ্যতালিকায় থাকলে ভালো হয়।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ও চাকরিজীবীদের অনেকেরই দুপুরে খাবার সময় ঠিক থাকে না। তাই তারা বিকেলে কিছু হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী বিকেলের জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেন সকল ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে।

রাতের খাবার সাধারণত সহজপাচ্য হওয়া উচিত। এজন্য রাতে আমিষজাতীয় খাবার কম খাওয়া ভালো। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে দুধ বা অন্য শক্তি উৎপাদক তরল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এভাবে খাদ্য বাছাই করে উন্নত জীবন যাপন করা যেতে পারে।

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, যা স্বাস্থ্যগত উপাদানের পরিবর্তে মুখোরচক স্বাদের জন্য উৎপাদন করা হয়। এগুলো খেতে খুব সুস্বাদু মনে হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই এই খাবার শরীরের জন্য ভালো নয়। সুস্বাদু করার জন্য এতে প্রায়শই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অস্বাস্থ্যকর। ফাস্টফুডে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ চর্বি ও চিনি থাকে। বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন, পিৎজা, চিপস, মচমচে ভাজা খাবার, কেক কিংবা বিস্কুটে উচ্চমাত্রায় প্রাণিজ চর্বি থাকে। সফ্‌ট ড্রিংক, কোলা কিংবা লেমনের মতো গ্যাসীয় পানীয়তে অতিরিক্ত চিনি থাকে। আমরা যখন অধিক পরিমাণে চর্বিজাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের দেহ এগুলোকে চর্বিকলায় রূপান্তরিত করে এবং অধিক পরিমাণে চিনি আমাদের দাঁত ও ত্বককে নষ্ট করে দিতে পারে। ফাস্ট ফুড কখনো সুষম খাদ্যের মধ্যে পড়ে না। ফাস্ট ফুডে আমাদের জন্য দরকারি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে। ফাস্ট ফুড খাওয়ার কারণে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়ে। প্যাকেট বা কৌটাজাত খাবারের চেয়ে প্রাকৃতিক সজীব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো।

একক কাজ

কাজ: কোনো একটি ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার নিয়ে তার মাঝে কোন কোন খাদ্য উপাদান আছে এবং কোনটি নেই তার তালিকা কর।

১.৪ খাদ্য সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক কারণে সব ধরনের খাদ্য সময়ের সাথে নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে: জীবাণু ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং পরিবেশের কারণে সেগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্যের মধ্যে উৎসেচকের বৃদ্ধি, পরিবেশে আর্দ্রতা, তাপে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই কারণগুলো এককভাবে খাদ্যকে নষ্ট করে না। কয়েকটি কারণ একত্রে সংগঠিত হয়ে খাদ্য নষ্ট করে। যেমন, পরিবেশে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে এবং খাবারকে নষ্ট করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যবস্তুর উৎসেচকের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে খাদ্যকে নষ্ট করে দেয়।

জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে সেখানে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। এই বিষাক্ত উপাদানগুলোকে টক্সিন বলে। এই টক্সিনগুলো নানা ধরনের হয় এবং কোনো কোনো টক্সিনে আক্রান্ত হওয়াকে আমরা ফুড পয়জনিং বলে থাকি। টক্সিন স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ইস্টজাতীয় ছত্রাক ফলের রস, টমেটোর সস, জেলি, মিষ্টি আচার, শরবত ইত্যাদি খাবার দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। এতে খাবারে টক গন্ধ হয় এবং ঘোলাটে হয়ে যায়। যদি পাউরুটি কয়েক দিন খোলা স্থানে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় এর ওপর ধূসর বর্ণের আবরণ তৈরি হয়েছে। এটি মোলড জাতীয় ছত্রাক (যেমন: মিউকর, এসপারজিলাস) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কমলালেবু, টমেটো, পনির, আচার প্রভৃতি টকজাতীয় খাবার এগুলোর দ্বারা সহজে নষ্ট হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা এক ঋতুর ফল, শস্য, সবজি, মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য অন্য ঋতুতেও পেতে পারি। বছরের কোনো একটি সময়ে ও স্থানে কোনো ফসলের উৎপাদন বেশি হলে তা সংরক্ষণের মাধ্যমে অন্য সময়ে ব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর বা রপ্তানি করতে পারি। কাজেই খাদ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা সংরক্ষণ করে আমরা আমাদের খাদ্যঘাটতি মেটাতে পারি।

১.৪.১ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

খাদ্য নষ্ট হয় জীবাণু বৃদ্ধি ও জীবাণু দ্বারা নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ার কারণে। পানি ও উষ্ণতা জীবাণু বৃদ্ধি ও উৎসেচকের ক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য খুবই উপযোগী অবস্থা। ফলে এ অবস্থা খাদ্যকে দ্রুত পচনে প্রভাবিত করে। পচনের সাহায্যকারী এসব বিষয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে খাদ্য বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। আমাদের বাসায় সাধারণ সংরক্ষক দ্রব্যের ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। এরকম কয়েকটি

পদ্ধতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. শুষ্ককরণ: খাদ্যবস্তুকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্ম এবং এনজাইম ক্রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। খাদ্যকে অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

২. রেফ্রিজারেশন: রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টিজাতীয় খাবার কিছুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। এ পদ্ধতিতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া, কোনোটাই দীর্ঘদিনের জন্য প্রতিরোধ করা যায় না।

৩. ফ্রিজিং: ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যকে ও খাদ্যদ্রব্যকে 0° ফারেনহাইট অথবা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন ভালো থাকে। ফ্রিজিং পদ্ধতিতে শুধু টাটকা শাক-সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস সংরক্ষণ করা হয় না, এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত খাবার, আইসক্রিম এবং বিভিন্ন রকমের তৈরি খাবারও সংরক্ষণ করা যায়।

৪. সংরক্ষক দ্রব্য: রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। এগুলোকে সংরক্ষক (Preservative) বলে। খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা এবং খাদ্যে যেন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে সেজন্য রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এগুলোর কোনো পুষ্টিগুণ নেই। সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে খাদ্যে সংরক্ষক প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো: এগুলোর সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে সংরক্ষণ খাদ্যে প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম।

(ক) ভিনেগার আমাদের অতিপরিচিত। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহার করে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসেটিক এসিডের ৫% দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

(খ) সালফেটের লবণ যেমন Sodium bisulphite অথবা Potassium-meta bisulphite ব্যবহার করে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।

(গ) Sodium benzoate, এটি Benzoic Acid— এর লবণ। এটি বিশেষ করে ছত্রাক ইস্ট এর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium benzoate খুব উপযোগী।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ছাড়া Propionic Acid— এর লবণ এবং Sorbic Acid— এর লবণ Sorbates ব্যবহার করে দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে

ব্যবহার করতে হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার না করে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেগুলো মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

৫. চিনি বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ: চিনি ও লবণের দ্রবণ খাদ্যসংরক্ষক হিসেবে বহুবছর পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবণের দ্রবণকে ব্রাইন বলে। চিনি ও লবণের ঘন দ্রবণ বহি-অভিস্রবণের দ্বারা অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে।

চিনি প্রয়োগ করে ফলের জ্যাম, জেলি ও মারমালেড তৈরি হয়। পেয়ারা, আপেল, আনারসজাতীয় ফলকে কেটে পরিষ্কার করে চিনির ঘণ দ্রবণে রেখে বায়ু নিরোধী করে দীর্ঘদিন রাখা যায়।

সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহারের আগে যদি খাদ্যের রঙের পরিবর্তন ঘটে অথবা খাদ্য ফুলে উঠে, খাদ্যের উপর সাদা অথবা কালো আন্তরণ সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের ওপরটা পিচ্ছিল হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না, কারণ তাহলে ফুড পয়জনিং হতে পারে।

১.৪.২ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া

বর্তমানে দুধ, ফল, মাছ এমনকি মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেচ্ছ ফরমালিন নামক বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু অসাধু ও বিবেকবর্জিত ব্যবসায়ী তারপরও ফরমালিনকে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করছে। এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে বদহজম, পাতলা পায়খানা, পেটের নানা পীড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি হতে পারে। ফরমালিন দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে মেয়েদের গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্ত হতে পারে।

বিভিন্ন ফল যেমন: আম, টমেটো, কলা ও পেঁপে যেন দ্রুত পাকে, তার জন্য Ripen এবং Ethylene নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে সে ফলকে ৭-৮ দিন পর বাজারজাত করা উচিত। কিন্তু তা না করে অনেক সময় ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায় এবং এ ধরনের ফল খাওয়ার ফলে মানবশরীরে জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ফল পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে ব্যবহার করা হয়। এটি এমন ধরনের যৌগ, যা বাতাসের বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসেই উৎপন্ন করে অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যা পরবর্তীকালে অ্যাসিটিলিন ইথানল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এটি স্বাস্থ্যের ভয়নক ক্ষতি করে।

আম যেন দ্রুত না পাকে এবং গাছে দীর্ঘদিন থাকে, সে জন্য আমাদের দেশে কিছু আম ব্যবসায়ী কালটার (Culter) নামের হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ গাছে স্প্রে করে। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ব হয় এবং

না পেকে দীর্ঘদিন গাছে থাকে। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

এসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য ভোক্তা অধিকার রক্ষায় ভোক্তা আইন আরও কঠিনভাবে প্রয়োগ করার জন্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ধরনের ফল না কেনার জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে। যারা এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে খাদ্য সংরক্ষণ করে এবং ফল পাকায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং জনগণের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে।

১.৫ তামাক ও ড্রাগস

তামাক গাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে তামাক তৈরি হয়। শুকনা তামাকপাতা কুচি কুচি করে কেটে তাকে বিশেষ কাগজে মুড়িয়ে সিগারেট এবং পাতায় মুড়িয়ে বিড়ি ও চুরুট বানানো হয়। এগুলোকে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ও বাষ্প সেবনকে ধূমপান বলে। তামাক থেকে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয়, যা মাদকদ্রব্য হিসেবে নার্ভকে যেমন সাময়িকভাবে উত্তেজিত করে, তেমনি নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে। ধূমপান করলে নিকোটিন ছাড়াও আরও কিছু বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে। ধূমপানের ধোঁয়ায় উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকে। এই পদার্থগুলো রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া কতগুলো আঠালো পদার্থ ও হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি এতে থাকে, যা ফুসফুসে নানা ধরনের ব্যাধি (চিত্র ১.০৬), এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

১.৫.১ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত মাদক হচ্ছে ধূমপান। ধূমপানের ফলে মানবদেহে যেসব ক্ষতিকারক অবস্থা ও রোগ দেখা দেয় সেগুলো হলো:

চিত্র ১.০৬: যেসব লোক ধূমপান করে না (বাঁয়ে) তাদের ফুসফুস এবং ধূমপায়ীদের (ডানে) ফুসফুস

১. ধূমপায়ীরা অন্যদের থেকে বেশি রোগাক্রান্ত হয়।

২. ধূমপায়ীরা কোনো না কোনো রোগে ভোগে যেমন: ফুসফুস ক্যান্সার, ঠোঁট, মুখ, ল্যারিংক্স, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, পাকস্থলীতে ক্ষত এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তঘটিত রোগ। ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দিলে রোগী প্রায় ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

৩. সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা বেশি ধূমপান করে, তাদের আয়ু কমে যায়।

৪. যেসব লোক ধূমপান করে না অথচ ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থেকে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদেরও শারীরিক ক্ষতি হয়।

১.৫.২ ধূমপান ও তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচেষ্টাসমূহ

১. বাস, রেল, খোলা স্থানে, রেস্তোরাঁয়, অফিস, হাসপাতাল, রেলস্টেশন প্রভৃতি এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে সেখানে ধূমপান করা এখন আইনত দণ্ডনীয় এবং আমাদের দেশে এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইনও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণে মানুষ এখনো যেখানে সেখানে ধূমপান করে আশপাশের বায়ুকে দূষিত করে যাচ্ছে। প্রচলিত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. বিক্রয়যোগ্য তামাকজাত পদার্থের মোড়কে "ধূমপান বিষপান" বা "ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর" কথাগুলো ছাপানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৪. স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকটে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

১.৬ ড্রাগ আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ড্রাগের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ড্রাগ এমন কিছু পদার্থ, যা জীবিত প্রাণী গ্রহণ করলে তার এক বা একাধিক স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

ড্রাগকে সাধারণ ভাষায় আমরা মাদক বলি। ক্রমাগত মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে মাদকদ্রব্যের সাথে মানুষের এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং নিয়মিতভাবে মাদক গ্রহণ না করলে শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় পড়ে, তখন তাকে বলে মাদকাসক্ত বা ড্রাগ নির্ভরতা (চিত্র ১.০৭)।

উল্লেখযোগ্য ড্রাগ যেগুলোর ওপর মানুষের আসক্তি সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট, আফিম ও আফিমজাত পদার্থ, হেরোইন, মদ, পেথিড্রিন, বারবিচুরেট, কোকেন, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, এলএসডি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে হেরোইন একটি মারাত্মক ড্রাগ।

ড্রাগের ওপর কোনো ব্যক্তির আসক্তি নানাভাবে জাগতে পারে, যেমন: কৌতূহল, সঙ্গদোষ, হতাশা দূর করার প্রচেষ্টা, মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকার পদ্ধতি, নিজেকে বেশি কার্যক্ষম করা, পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কিংবা পারিবারিক অভ্যাসগত। বাবা বা মা কোনো মাদকে আসক্ত থাকলে তার থেকে সন্তানে ওই মাদকে আসক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা থাকে।

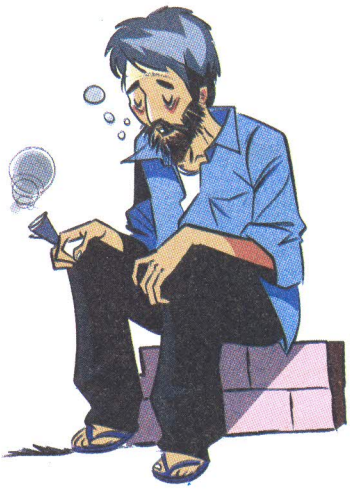

চিত্র ১.০৭: মাদকাসক্তি একজনের জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

১.৬.১ মাদকাসক্তির লক্ষণ

যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্যে আসক্ত, তার মধ্যে কতগুলো লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকগুলো লক্ষণ সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হলো এরকম:

১. খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া

২. সবসময় অগোছালোভাবে থাকা

৩. দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা এবং চোখ লাল হওয়া

৪. কোনো কিছুতে আগ্রহ না থাকা এবং ঘুম না হওয়া

৫. কর্মবিমুখতা ও হতাশা

৬. শরীরে অত্যধিক ঘাম নিঃসরণ

৭. সবসময় নিজেকে সবার থেকে দূরে রাখা

৮. আলস্য ও উদ্বিগ্ন ভাব

৯. মনঃসংযোগ না থাকা, টাকা-পয়সা চুরি করা এমনকি মাদকের টাকার জন্য বাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে গোপনে বিক্রি করা ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছাড়াও কিছু সামাজিক তথা পরিবেশের কারণেও মাদকদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মাতে পারে, যেখান থেকে সে ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির কতগুলো কারণ ছকে উল্লেখ করা হলো:

পরিবেশগত কারণ	পরিবারের কারণ
১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ২. বেকারত্ব ৩. অসামাজিক পরিবেশ ৪. অল্প বয়সে স্কুল থেকে বিদায় ৫. সিনেমা বা কোনো টিভি সিরিয়াল দেখা ৬. আশপাশে ড্রাগের রমরমা ব্যবসা ৭. পেশাগত কারণ ৮. অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বেশি হয়, সে সব স্থানে বাস করা ৯. যেখানে ড্রাগ নেওয়ার সুযোগ বা দল থাকে, তার আশেপাশে বসবাস করা	১. বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণের অভাব ২. হতাশা ৩. একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা ৪. সন্তানের বেপরোয়া ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া ৫. পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা ৬. সন্তানের প্রতি যত্নহীনতা ৭. উগ্র জীবনযাত্রা বা মানসিকতা ৮. খারাপ সাহচর্য

১.৬.২ ড্রাগ আসক্তি নিয়ন্ত্রণ

কোনো ব্যক্তি ড্রাগের উপর আসক্ত হলে তা বন্ধ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ ড্রাগ আসক্ত মানুষ নিজের শরীরে মাদকের কুপ্রভাব বুঝতে পেরেও সেটা ছাড়তে পারে না। সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মাদকদ্রব্যে আসক্তি কমানো যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি সহযোগিতা না করে তাহলে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। মাদক নিরাময় হাসপাতাল অথবা কেন্দ্রে মাদকাসক্ত মানুষকে ভর্তি করতে হবে এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে।

প্রথমে আসক্ত ব্যক্তিকে তার ড্রাগ নেওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করতে হয়। লক্ষ রাখতে হয় কোনোভাবেই যেন তার কাছে মাদকদ্রব্য পৌঁছাতে না পারে। এরপর তার মানসিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়, যেন সে ড্রাগের কথা মনে আনতে না পারে, তার জন্য তাকে বিশেষ কোনো কাজে যুক্ত করতে হয়। সে যে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়, সেটি একবারে হঠাৎ করে বন্ধ না করে ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে শেষে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হঠাৎ করে বন্ধ করা শারীরিকভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। ঘুম ঠিকমতো না হলে বা বেশি অস্থিরতা বা বিদ্রোহীভাব দেখা দিলে ডাক্তাররা স্নায়ু শিথিলকারক ঔষধ এবং ঘুমের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন।

মাদক সেবন শুধু যে ড্রাগ আসক্ত মানুষটির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা তা নয়, মাদক সেবন যেকোনো পরিবারে বড় রকমের সমস্যা ও বিশৃংখলা বয়ে আনে। এই সমস্যা সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে সমাজের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ধনী হয়, কিন্তু অন্যদিকে অনেক মানুষের এবং সমাজজীবনে ভয়াবহ দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে আসে। সম্ভাবনাময় ছাত্র-

ছাত্রীদের পড়ালেখা নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয় মাদকাসক্তির কারণে অকালমৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ জন্য মাদকদ্রব্য সেবন ও এর ব্যবসা-বাণিজ্য কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এর জন্য ব্যক্তিগত এবং সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি দেশের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সরকারি প্রচেষ্টা মাদক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে।

সামাজিক প্রচেষ্টা

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া।

৩. পুনর্বাসন করে সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে এনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

সরকারি প্রচেষ্টা

১. মাদক সেবন, বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে কড়া আইন প্রণয়ন করে কঠোরভাবে সেগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

২. মাদক সেবনের কুপ্রভাবগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যম দ্বারা মানুষকে অবহিত করা।

৩. আমাদের দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ আছে। আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষ ও দেশকে অনেকটুকু বাঁচানো সম্ভব হবে।

১.৭ এইডস (AIDS)

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রোগ হচ্ছে 'এইডস'। এটি একটি সংক্রামক রোগ। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আমেরিকায় AIDS চিহ্নিত হয় এবং তখন থেকে সারা বিশ্বে AIDS মরণব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক নিয়মে সব মানুষের দেহেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে, একে ইমিউনিটি বলা হয়। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবরকম জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি। রক্তের লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। AIDS— এ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং একসময় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ জন্য রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাকুয়ার্ড ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম' যা সংক্ষেপে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)। এক ধরনের ভাইরাস, যার নাম Human Immuno Deficiency Virus (চিত্র ১.০৮),

এবং যাকে সংক্ষেপে HIV বলা হয়, এই AIDS রোগের সংক্রমণ করে থাকে।

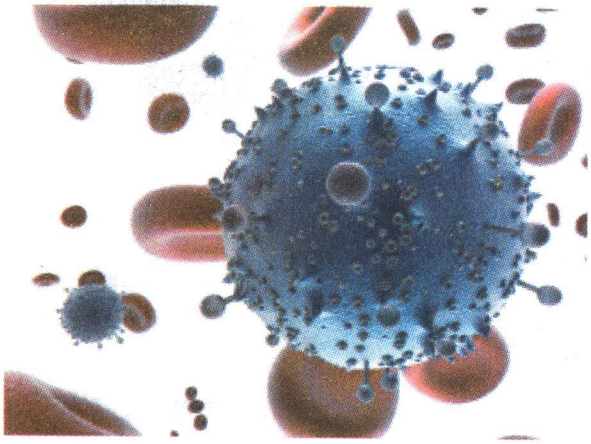

চিত্র ১.০৮: রক্তে HIV ভাইরাস

১.৭.১ AIDS রোগের কারণ

HIV দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দেহের রক্তস্রোতে প্রবেশ করার পর HIV রক্তের শ্বেত কণিকার T- লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করে। এ কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে নানা রকমের বিরল রোগের সংক্রমণ ঘটে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ এবং টিউমার। দেখা গেছে HIV ভাইরাস সংক্রমণের পর প্রথম ৫ বছর পর্যন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এসব মানুষ তখন এই রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে এবং তখন তারা অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

এ রোগে কারা বেশি আক্রান্ত হতে পারে সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক তথ্যই জানা গেছে। প্রধানত যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমেই আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে HIV সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। সমকামী কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সংযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভবতী নারী এ রোগে আক্রান্ত হলে তার সন্তানদের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে আক্রান্ত নারীর দেহ থেকে সদ্যোজাত শিশুর দেহে HIV সঞ্চারিত হতে পারে। এছাড়া রক্ত সঞ্চালনের সময় AIDS আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে কিংবা ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সঞ্চারিত হয়ে থাকে। খাদ্য, পানি, মশা বা কীটপতঙ্গ অথবা এইডস রোগীর সাধারণ স্পর্শের দ্বারা এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। তবে রক্ত, বীর্য, লালা, অশ্রু ইত্যাদি শারীরিক তরলের মাধ্যমে AIDS সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

AIDS প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, HIV সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া। অন্যকে সংক্রমিত না করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং নিজেকে HIV সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। রক্তদান বা গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সম্পর্ক এবং ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত করে AIDS রোগের বিস্তার কমানো যায়। সরকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো মরণব্যাধি AIDS— এর সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এ রোগ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা যেতে পারে।

১.৮ স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা এবং বিশ্রাম

শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। তাই শরীরকে মানুষের জীবনসংগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলা যেতে পারে। এই হাতিয়ারকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য চাই সুষম খাদ্যের পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের শারীরিক দৃঢ়তা।

মানুষের জীবনে নিয়মিতভাবে ঘুম, খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া আবশ্যক, এগুলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে কাজকর্ম করতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, এগুলো কোনোভাবেই শরীরের সুপ্ত সম্পদগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে না। এই বিকাশ একমাত্র নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। একটা গাছের সবকিছু নির্ভর করে তার শিকড়ের ওপর, ঠিক তেমনি মানুষের চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে তার স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার ওপর। সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র গড়তে হলে নিয়মিত অঙ্গ চালনার সাহায্যে উপযুক্ত এবং পরিমিত শরীরচর্চার প্রয়োজন আছে।

আমরা সকলেই জানি, স্নায়ুতন্ত্র শরীরের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই যদি নিয়মিত মাংসপেশির ব্যায়াম করি, তাহলে সহজেই স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ এবং সক্রিয় করে তোলা যাবে। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যদি শরীরের বিভিন্ন দেহতন্ত্র বা জৈব তন্ত্রগুলোকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে সেগুলোরও পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটবে এবং যার ফলে আমাদের দৈনিক কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। দৈনিক নিয়মিত কয়েক মিনিট শরীরচর্চার মধ্য দিয়েই শরীরের পরিপাক করার ক্ষমতা বাড়াতে পারব, রক্ত চলাচলের ক্ষমতা ভালো করতে পারব, পাচন ক্ষমতা ভালো হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভালো হবে, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণও আরও সুষ্ঠু হবে। এক কথায় বলা যায়, একটা সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, মাংসপেশির সক্রিয়তা এসব ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নিয়মিত এমন কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা করতে হবে, যেন শরীরের প্রধান মাংসপেশিগুলো সক্রিয় এবং উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বয়স, দৈহিক গঠন, সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে ব্যায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ব্যায়াম যে শুধু নিরানন্দ পরিশ্রমের একটি বিষয় তা কিন্তু নয়। সব রকম খেলাধুলা একদিকে আনন্দের ব্যাপার, অন্যদিকে এগুলো শারীরিক ব্যায়ামও বটে। আজকাল ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার, হাঁটা, সাইকেল চালানো, কারাতে থেকে শুরু করে ফুটবল, টেনিস, হকি, ক্রিকেট এসব খেলছে। শরীর ঠিক রাখার জন্য শুধু যে নিয়ম করে ব্যায়াম করতে হয় তা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও সেভাবে গড়ে তুলতে হয়। একজন মানুষ প্রতিদিন যদি ৮ থেকে ১০ হাজার পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সে সুস্থ ও নীরোগ একটি দীর্ঘ জীবন আশা করতে পারে।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরের পেশিগুলো অবশ হয়ে আসে, তখন সারা শরীরকে কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম করাকে আমরা বিশ্রাম বলি। ঘুমই শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম।

দেহ-মনকে সুস্থ ও সতেজ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের কমপক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮/৯ ও শিশুদের ১০/১২ ঘণ্টা করে ঘুমের প্রয়োজন। যারা রাতে কাজ করে, তাদের অবশ্যই দিনের বেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

মনের বিশ্রাম: কেবল শরীরেরই নয়, মনেরও বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শরীর ও মন থেকে সমস্ত রকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, একেবারে দূর করে দিয়ে দেহ-মনকে একান্তভাবে নিদ্রার কোলে সঁপে দিতে পারলে তবেই দেহ মনের পক্ষে প্রকৃত বিশ্রাম হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, এক কাজ থেকে অন্য কাজে মনোনিবেশ করেও শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম বলা হয়। কঠিন কায়িক শ্রমের পর চিত্তবিনোদন বিশ্রামেরই নামান্তর। আবার কঠিন মানসিক পরিশ্রমের পর কর্মান্তর বিশ্রাম খোঁজার একটা উপায়।

বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাউনটেন পেন পরিষ্কার করে যাচ্ছেন। এতে তিনি কিন্তু আসলে তাঁর কাজের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। অনেকে ছবি আঁকেন, অনেকে বাগান পরিচর্যা, পশুপাখি পালন কিংবা শৌখিন সবজি বাগান তৈরি করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কাজকেই বলে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ।